সখি ভালোবাসা কারে কয়

শিবনারায়ন রায়

Und doch, whelch Gluck, geliebt zu werden!
Und lieben, Gotter, weldch ein Gluck! Goethe
আর তবুও কী আনন্দ, কী আনন্দ, ভালোবাসা পেয়েছি, ভালোবেসেছি!
-গ্যোয়েটে ।।

ফ্লরেন্সে উফ্ফিজি (Uffizeগ্ন গ্যালারিতে প্রহরকাল বিস্ময়ে, আনন্দে, পরিপূর্ণ হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বত্তিচেল্লির আঁকা বিরাট ক্যানভাসে আফ্রোদিতি আনাদাইওমেনি (Aphrodite Anadyomene)- র ছবি। সমুদ্রোত্থিতা নগ্নমূর্তি অপরূপা সুন্দরী উন্মোচিত ঝিনুকটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, ডান হাতটি প্রস্ফুটিত স্তনের উপরে, বাঁহাতটি আড়াল করেছে উর সংযোগস্থল, অলকদাম কিছু উড়েছে আকাশে, কিছু পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে জঙঘার সীমান্তে। রবীন্দ্রকল্পনায় যে নির াবরণ রূপের সামনে মদন নতজানু হয়েছিল এ সেই রূপ। বত্তিচেল্লির তুলিতে ধরা দিয়েছিল রেনেসাঁসের আত্মা।

বত্তিচেল্লির মডেল ছিলেন জুলিয়ানো দ্য মেদিচির রক্ষিতা তনুশ্রী সিমোনেত্তা। ইতিহাসের ঝাঁটায় সে মেয়েমুছে গেল, কিন্তু মহাশিল্পীর ছন্দিত রেখায়, স্বর্ণাভ বর্ণাবিভঙ্গে অপ্রতিম কল্পনায় সেই সৌন্দর্য সময়কে জয় করে এখনও সমুদ্রতরঙ্গ তুলছে দূরদেশি দর্শকের চেতনায়। জীবন সায়াহে পৌঁছে সেই আফ্রোদিতির কথা ভাবছি যে স্বসমুখা, স্বরীশ্বরী। সমুদ্রের ফেনায় ভ াসতে ভাসতে ঝিনুকের আবরণ খুলে ফেলে নগ্ন সৌন্দর্য নিয়ে যে একদা আবির্ভূত হয়েছিল সৌন্দর্যের এবং প্রেমের প্রতিমূর্তি রূপে।

গ্রীকরা প্রেমের দেবী আফ্রোদিতিকে কল্পনা করেছিলেন ঋিপ্রকৃতির আত্মা ত্রিলোকবাসিনী রূপে। আকাশে তিনি আফ্রো দিতি উরানিয়া (Urania), কামোর্ধ প্রেম তাঁর মন্ত্র, পরিশ্রুত বাসনাকে যে শক্তি ঊর্ধমুখী করে। মৃত্তিকায় তিনি ইন্দ্রিয়জ অ ানন্দের অক্ষয় উৎস - সংগমের যে আনন্দ ফুলে ফলে, সন্তান - সন্ততির জন্মের ভিতর দিয়ে পরিণতি পায়। ভূলোকে তিনি বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী, রঙ্গে রসে, প্রাণের পরিপূর্ণতায় তাঁর প্রকাশ। আর মহাসমুদ্রে তিনি নাবিকদের পথপ্রদর্শিকা, এক মহাদেশের সঙ্গে অন্য মহাদেশের যোগসাধিকা। একাকিতায় মানুষ অপূর্ণ; অপরের সঙ্গে যোগের সূত্রেই তার বিকাশ সম্ভব।আর যোগসাধনের প্রধান উৎস প্রেম।

কিন্তু গ্রীকরা শুধু কল্পনাপ্রবণ কবি ছিলেন না, দার্শনিকতা ছিল তাঁদের মনের গঠনে আরেকটি মুখ্য উপাদান। তাই ভালে াবাসা নামে নিত্যব্যবহৃত ছোট শব্দটিকে নিয়েও সারারাত গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন সক্রেটিস এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ। সেই আলোচনার অতুলনীয় বিবরণ রেখে গেছেন তাঁর শিষ্য প্লেটো যে সুস্বাদু কেতাবটিতেইংরেজ অনুবাদে ত ার নাম সিম্পোজিয়ান বা দ্য ব্যাঙ্কুয়েট। ভালোবাসার রকমফের নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা ব্যাখ্যা শোনবার পর গু সক্রেটিস বললেন, - অপ্রাপনীয়ের জন্য যে অলঙঘ্য বাসনা তারই অপর নাম প্রেম। এ সেই অসাধ্যসাধনীয় অনুসন্ধান যা অস্তিত্বকে পরিপূর্ণতা দেয়। প্রেম সম্বন্ধে এই ধারণা যুগ যুগ ধরে রোম্যান্টিক কবিদের পেপ্ররণা যুগিয়েছে - শেলীর সেই ‘তারার জন্য মথের কামনা’য়, রবীন্দ্রনাথের সেই ‘যে-অমৃত লুকানো তোমায় সে কোথায়’ যৌবনের আকুল প্রশ্ন। যাঁরা ভক্ত তাঁরাও হয়তো এই ধারণা নিয়েই তাঁদের দেবতাকে আমৃত্যু খোঁজেন। সেই অপ্রাপনীয় কৃষ্ণ-কানহাইয়ার প্রেমেই কি

মীরাবাঈ স্বামী, সংসার, পরিজন, রাজ্যপাট সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েননি?

কিন্তু এই রহস্যমন্ডিত আকুতির তো সাধুভাষায় আখ্যা প্রেম যা নাকি 'নিষ্কাম নিকষিত হেম'। চলতি বাংলায় আমরা যাকে ভালোবাসা বলি তাকে কি এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যায় ধরা যায়? মা আর শিশুর ভালোবাসা, মধ্যবিত্ত সংসারী বাঙালির ইলিশ মাছ আর ল্যাংড়া আমের প্রতি ভালোবাসা, সন্ধ্যার আকশে মেঘে মেঘে নানা রং - এর খেলা দেখতে ভালোবাসা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা জীবনানন্দের কবিতাকে ভালোবাসা, যুবক যুবতীর 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' ভালোবাসা, ব াংলাভাষাকে ভালোবাসা - প্রতি ক্ষেত্রেই কি আমরা ভালোবাসা শব্দটিই ব্যবহার করি না? কী সেই লক্ষণ যা এদের সকলকে একই জ্ঞাতার্থের অন্তর্ভুক্ত করে?

অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক আলোচনা, কেতাবাদি পাঠ এবং জীবনে বারবার পোড় খাওয়ার পর তিরাশি বছরে পা দিয়ে অ াজও জোর করে বলতে পারব না এ প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর আমার জানা আছে। তবে কিছু কিছু সর্ববোধ্য লক্ষণের কথা বলতে পারি। ভালোবাসার প্রথম লক্ষণ হয়তো ভয় মেশানো আনন্দ। আনন্দ তো বটেই, যাকে ভালোবাসি তার সান্নিধ্যে আনন্দ, তার কথায় আনন্দ, তার স্পর্শে আনন্দ। একথা মা এবং সন্তানের পক্ষে যত সত্য, প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষেত্রেও ততট া সত্য। পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন যাতে পুলকিত হয় তাই তো ভালোবাসা। আর ভয়! যে প্রিয়তম সদাসর্বদা তাকে হারাবার ভয়। যাকে ভালোবাসি সেযদি আমাকে ভালো না বাসে, সে যদি চলে যায়, তার যদি মৃত্যু ঘটে, এই ভয় ভালোবাসার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে অনুস্যূত থাকে। রাধার ভালোবাসার কি তুলনা আছে? কিন্তু যে লম্পটের জন্য সেই সর্বস্ব সমর্পণকা রিণী নারী সমাজ, সংসার, কূল সবই ত্যাগ করেছিল, সে যখন তাকে ভাঁওতা দিয়ে রাজ্যপাটের লোভে কেটে পড়ল, তখন কি শ্রীমতীর একূল ওকূল দুকূল আর্ত ভালোবাসার স্রোতে ভেসে যায়নি? কিন্তু তবু 'কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয় া'! সীতা হয়তো জীবনে কোনোদিনই প্রেমের স্বাদ পায়নি, কিন্তু আনন্দে বেদনায়, ভয়ে ভালোবাসায়, তাগে, বঞ্চনায় রা ধিকার মতো কে ভালোবেসেছে?

ভালোবাসার দ্বিতীয় লক্ষণ স্বার্থের অন্ধ বন্ধন থেকে সাময়িকভাবে হলেও মুক্তি। শিশুর ধারণা তার জন্যইঝিজগতের সৃষ্টি, তাকে কেন্দ্র করেই ঝিজগৎ ঘোরে, বহু স্ত্রী - পুষই কিন্তু দৈহিক বয়ঃপ্রাপ্তির পরও এই আত্মরতির ঘোর কাটিয়ে উঠতে প ারে না। তাদের কাছে নিজের সুখ এবং স্বার্থই প্রধান, অপরে (সে জড়ই হোক বা জীবিতই হোক) তারা দেখে তাদের ভে াগের বা স্বার্থসিদ্ধির উপায় বা উপাদান হিসাবে। কিন্তু যখন মানুষ ভালোবাসে তখন নিজের সুখ-দুঃখ, স্বার্থসিদ্ধির চ াইতে হঠাৎ অনেক বেশি গভীর ভাবে অনুভব করতে ভালোবাসার জনের সুখ - দুঃখ প্রয়োজন প্রত্যাশা। তার কল্যাণ নিজের সুবিধা স্বার্থের চাইতে পূর্বিতা পায়, ভালোবাসার এই অভিজ্ঞতা যে স্ত্রী - পুষের হয়নি সে নিতান্ত হতভাগ্য। ভালে াবাসার অনুভূতির ভিতর দিয়ে অপর ব্যক্তি নিজের চাইতে প্রধান হয়ে ওঠে, মনের অনেকগুলো বন্ধ দরজা - জানলা খুলে যায়, দুজনের মিলিত মন নিয়ে যে জগৎকে দেখি একজনের চোখ দিয়ে দেখা জগতের চাইতে তা অনেক সমৃদ্ধ। কোনো কে ানো দার্শনিকের মতো নীতিবোধের প্রধান উৎস এই পরার্থপর ভালোবাসা। যতক্ষণ মন আত্মরতির গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থ াকে ততক্ষণ নীতিবোধ জাগ্রত হয় না। যখন আমাদের ভাবনা চিন্তা, আচার, আচরণ অপরের ভালমন্দ, সুখদুঃখের স ম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং সে বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই নৈতিকতার সূচনা ঘটে। ভ ালোবাসা তাই শুধু ভয় - মেশানো আনন্দের দ্বারা চিহ্নিত নয়, তার ভিতরে বিবেকের বীজও নিহিত থাকে।

তবে জীবনে ভালোবাসাকে যতই না কেন অমূল্য জ্ঞান করি, কারও জীবনে কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তিরপ্রতি ভালোবাসা যে চিরস্থায়ী বা একব্রতী হতেই হবে এমন শাস্ত্রনির্দেশ অভিজ্ঞতার ধোপে টেকে না। পুষজাতির ধুরন্ধর শাস্ত্রকারেরা অনেক হিসেব করে 'সতীধর্মের' কল্পনা করেছিলেন। নারী পুষের বীজবপনের ক্ষেত্রে, সেখানেমালিকের দখলটি পুরোপুরি নিশ্চিত রাখা চাই, সেখানে যেন অন্যের প্রবেশ না ঘটে। অতএব বিবাহ এবং বিবাহেরপরে সীতা, সতী, সাবিত্রীর মডেল অনুসরণ। কিন্তু পুষ তার বীজ যত্র-তত্র বপন করতে পারে, সেটি তো তার পৌষের লক্ষণ। যাদুবলে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে শত শত গোপীতে একই সময়ে সগত হয়েছিলেন; রাজা হবার পর যাদুর প্রয়োজন হয় নি, সহস্রাধিক রানি ছিলেন তাঁর নর্মসঙ্গিনী। আর তঁ ার সখা এবং শিষ্য মহাবীর অর্জুন? দেশে বিদেশে কত রাজকন্যার হৃদয় এবং দেহ সম্ভোগ করেছিলেন মহাভারতকার ত ার পুরো হিসেব দিয়ে উঠতে পারেন নি। আর মাত্র বারোটি নারীতেই কি পয়গম্বরের তৃপ্তিসাধন হয়েছিল? কিংবা বিপ্লবের মহাভাবুক ডাঁ - জাক্ সো অথবা বায়রনী কাব্যের চিত্তচমৎকারী নায়ক ডন জুয়ান?

সতীত্বের আদর্শ এবং বিবাহের নিয়ম - কানুন পুষদের বানানো, এবং সেক্ষেত্রে ভালোবাসার বদলে লৈঙ্গিক অসাম্য এবং অত্যাচারটাই বেশি প্রকট। কিন্তু স্ত্রী এবং পুষকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে না দেখে যদি লিঙ্গনির্বিশেষে শুধাই, মানুষ সত্যিই কি জীবনে শুধু একবারই একজনকে ভালোবাসে? গ্যোয়েটে যাকে বলেছেন 'ইলেক্‌টিভ্‌ অ্যাফিনিটি,' বাংলায় যাকে আমরা 'তারা মৈত্রী' বলি, ভালোবাসার ক্ষেত্রে ক'জনের জীবনে তা ঘটে? ব্যতিত্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু জীবনের সাধারণ নিয়মে প্রথম ভালোবাসা একদিন তার কূলভাঙা স্রোত হারায়, তখন অধিকাংশ সংসারী স্ত্রীপুষের জীবনে যা থাকে তা অভ্যাস, সুখস্মৃতির চর্বিত-চর্বন, মুখ্যত পরস্পর পরস্পরকে মেনে নেওয়ার প্রয়াস, যারা সৌভাগ্যবান যা যাদের প্রাণশক্তি প্রবল তারা হয়তো আবার ভালোবাসে, আবার তাদের জীবনে ফুল - ফলের নতুন করে সমারোহ ঘটে, নতুন পর্ব শু হয়। এটা মেনে নিলে পুরোনো শাস্ত্রবচন গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে জীবনের নতুন নীতিশাস্ত্র রচনা করতে হয় যে শাস্ত্র অনুসারে স্ত্রী এবং পুষ সব ক্ষেত্রে, এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ভালোবাসার ক্ষেত্রে, সমান স্বাধীন। আর যেহেতু কোনো ভালোবাসাই সম্ভবত জীবনভোর টেকে না, যেহেতু হৃদয়শালিনী এবং হৃদয়শালী স্ত্রী - পুষ জীবনে অনেকবারই ভালোবাসার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যায় অথবা যেতে পারে, সে কারণে তার মূল্য সাময়িক ভাবে হলেও, তার কূলভাসানো প্রাণশক্তি মোটেই তুচ্ছ নয়। মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথের কথা।

আরও জানি
অনিত্য বলেই তুমি, দীপ্র তব নয়নের বাণী,
মদালস নিকুঞ্জের অন্ধকার নাশি,
বিদ্যুদ্‌বিলাসসম ফুটেছিল, সহসা উদ্ভাসি
মোর ক্ষিপ্র বাসনার পৃথুল প্রসার।
("সর্বনাশ", অর্কেষ্ট্রা)

এবং এমনও কোনো কারণ দেখি না, কেন একজন একই সময়ে পাঁচজনকে ভালোবাসতে পারবে না ? দ্রৌপদী পারেনি? তার ভালোবাসার সিম্ফনিতে মেলেনি কি পাঁচটি পুষের প্রতি তার অনুরাগের পাঁচটি বিচিত্র সুর? সংসারের সব মেয়েকেই গান্ধারী হতে হবে এ কোন নির্দেশ? অথবা বিশ বছর ধরে ট্যাপেস্ট্রি বোনা প্রতীক্ষমাণা বিরহিনী পেনেলোপি?

আনন্দ দেয়, মুক্তি দেয়, জগতের সঙ্গে যুক্ত করে, ভঙ্গুর বিস্রস্ত জীবনে কিছু সময়ের জন্যও অমৃতস্বাদ নিয়ে আসে - এজন্য ভালোবাসা অমূল্য। তবু হায়! তাকেও একেবারে বিশুদ্ধ বা অনন্যতন্ত্র বলতে পারিনা। প্রথমত, ভালোবাসার উৎস প্যাশন, বিচারবুদ্ধি নয় - তার প্রবল স্রোত কোথায় কতদূরে নিয়ে যেতে পারে এ হিসেব করে কেউ ভালোবাসে না। অনেক সময়ে তার জন্য চড়া দাম দিতে হয়। দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজনএকটি তণ একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল; যখন সে শুনল অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মেয়েটি বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে,তখন কাউকে কিছু না বলে দুঃসহ অভিমানে সে আত্মহত্যা করে। যদি সে আগে আমাকে মন খুলে বলত আমি তাকে বোঝাবার অন্তত চেষ্টা করতাম। অবশ্য তাতে কোনো ফল হত কিনা জানি না। তবে মেয়েটিকে আমি এক্ষেত্রে দোষ দিতাম না, তণটিকে বোঝাবার চেষ্টা অন্তত করতাম যে প্রথম ব্যর্থ প্রেমের চাইতে জীবন অনেক বড়, অনেকপ্রতিশ্রুতিসমৃদ্ধ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিশোরীটি যাকে ভালোবেসেছিল সে তাকে ঘরছাড়া করে শেষ পর্যন্ত এক যৌনকর্মীর আড়তে বিক্রি করে দেয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যদিবা তাকে উদ্ধার করা গেল, পিতৃগৃহে তার আর স্থান হল না। দৈনিক পত্রিকায় এ ধরনের ঘটনার কথা আমরা প্রায়ই পড়ি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটলে খটকা লাগে শুধু ভালোবাসার সামর্থ্য কতখানি!

তার চাইতেও ব্যাপক এবং দৃঢ়মূল যে সমস্যা তা হল, যে ভালোবাসে সে যেমন ভালোবাসার জন্য সব ছাড়তে রাজি আছে, তেমনি এই ত্যাগের বদলে সে তার ভালোবাসার জনকে নিজের একান্ত সম্পত্তি করে পেতে চায়।এই সমস্যা বিশেষ করে প্রকট মা এবং ছেলের সম্পর্কের মধ্যে। মা ছেলের জন্য দুঃখ সইতে পারে, শুধু তাকে দিতেচায় না অপর কোনো নারীকে ভালোবাসার পূর্ণ স্বাধীনতা। শাশুড়ি-বউমার বিরোধ শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখেছি। ভালোবাসার মধ্যে এই যে স্বত্ববোধ এটিই ভালোবাসার মারণ বীজ। স্বামী তো স্ত্রীকে সতী রাখতে চায়, তিন্তু স্ত্রীও চায় না স্বামী অন্য কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট বোধ কক। জন্ম নেয় ঈর্ষা, সন্দেহ, ধবংসের প্রবণতা। যা ছিল আনন্দের, মুক্তির, যোগাযোগের উৎস তাই হয়ে দাঁড়ায় যন্ত্রণার, বন্ধনের, বিরোধের হেতু।

ফ্রয়েড তাঁর মনস্তত্ত্বে এরস (Eros) বা কামকে সবিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এদেশের শাস্ত্রকাররা যতই ধর্ম এবং মোক্ষের কথা বলুন তাঁরাও জানতেন শৃঙ্গারই আদিরস। আর তা যে সত্যি সেটা বোঝবার জন্য বাৎস্যায়নের কামসূত্রের দরকার হয় না, গুহায় এবং মন্দিরে বৌদ্ধ এবং হিন্দু চিত্রকর এবং ভাস্কররা যে সব অনবদ্য রূপ এঁকে অথবা খোদাই করে গেছেন তারাই তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। গ্রীক পুরাণ অনুসারে সৃষ্টির আগে যে অন্ধকার মহাবিশৃঙ্খলা (Chaos) বিরাজমান ছিল তার ভিতর থেকেই এরসের উদ্ভব। এবং গ্রীক কবি হেসিয়ড (Hesiod)-এর বিবরণে এরস হলেন সেই মহাশক্তি যা এই বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল জগতের বিকীর্ণ উপাদানকে সংহত করে এই ঝিপৃথিবী এবং তার বিচিত্র পশুপাখিকে সৃজন করেছে। সৃজন প্রেমের ধর্ম। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ফ্যাসিস্তএবং নাট্‌সিদের ভয়াবহ কান্ডকারখানা দেখে ফ্রয়েডের মনে হয়েছিল হয়তো মানুষের মনের গঠনে এরস্‌ - এর চাইতে থানাটস (Thanatos) এর শক্তি প্রবলতর। মৃত্যু - দেবতা বা যমের গ্রীক নাম থানাটস। রাত্রির সে সন্তান, চিরন্তন অন্ধকারে তার নিবাস,মানুষের মধ্যে যে সব বৃত্তি প্রেমের বিরোধী, সৃষ্টির বিরোধী, যোগরচনার বিরোধী - ঈর্ষা, লোভ, শক্তির মত্ততা, আগ্রাসন এবং ধবংসের আভিমুখ্য - সেগুলির উৎস মানুষের অন্তর্নিহিত এই মৃত্যুবৃত্তি বা থানাটস। ফ্রয়েড জানতেন জ্ঞানের সহায়তায়, বুদ্ধির আলোকে এরসের বলাধান জরি, কিন্তু থানাটসের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যকে যে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যাবে, সে বিষয়ে তার মনে সংশয় শেষজীবনে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। ফ্রয়েড তাঁর The Future of an Illusion এবং Civilization and its discontents বই দুটি লিখেছিলেন এখন থেকে সত্তর বছরেরও বেশি আগে। বই দুটি পড়ি ছাত্রাবস্থায় ত্রিশের দশকে। তখন আমি মার্ক্সের চিন্তার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝিব্যাপী হত্যাকান্ডের অভিজ্ঞতার পরও মানুষের শুভবুদ্ধির ওপরে আস্থা তখনও নড়েনি। যৌবনকালের সেই গভীর প্রত্যয় ক্রমে আঘাতে আঘাতে কৃশিত হয়েছে। গুজরাত, আফগানিস্তান, বাগদাদের পর আজ মনে ফ্রয়েডের মতোই সংশয় জাগে, তবে কি থানাটস বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যরভাষায় ‘অপ্রেম’ -এর কাছে আত্মবলিই মানব - ইতিহাসের ভাগ্য! আফ্রোদিতির মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েও কি শেষ পর্যন্ত ভালোবাসার অজেয় শক্তিতে ঝিাস বজায় রাখা গেল না!

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com